আনাতোলি কারানভ
নিকোলাই ইয়ের্দমান

মুরজিলকার এডভেঞ্চার

অনুবাদ : চৈতী রহমান

সম্পাদক মশাই মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এক্ষুনি এক্ষুনি তার দরকার একটা ছবি, যে ছবি কিনা বসবে ছোটদের পত্রিকা মুরজিলকার এবারের মলাটে। খুবই জরুরি ভিত্তিতে তাই ছবি চাই। কিন্তু হয়েছে কি পত্রিকার সব লোক কাজে চলে গেছে দূরে দূরে। ছোট্ট সোয়ালো পাখিরা গেছে সমুদ্দুরের ওপারে, খবর আর তথ্য যোগাড় করতে। বড়সড় সারস পাখি গেছেন আকাশের উঁচুতে উড়ে উড়ে খবর সংগ্রহ করতে। তাই সম্পাদক মশাই মুঠো পাকিয়ে ধুড়ুম করে টেবিলে কিল মারলেন। তারপর টেলিফোন তুলে হাঁক ছাড়লেন, “এক্ষুনি এক্ষুনি মুরজিলকাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনো!”

কড়াৎ করে বাজ পড়ল। এক মিনিটের মধ্যে টেলিগ্রাম লেখা হয়ে গেল। সবচেয়ে দ্রুত যে টেলিগ্রাম যায় তার নাম হল বিজলি। বিজলি টেলিগ্রাম মাঠ ঘাট নদী নালার ওপরে চমকায় আর তা ধরা পড়ে বনের টেলিগ্রাফে।

কাছিম দিদিমা হনহনিয়ে চললেন টেলিগ্রাম পৌঁছতে।

তিনটি পাইন গাছ পেরিয়ে, একটি আধভাঙ্গা গাছের গুঁড়ি পেরিয়ে তবে কাছিম দিদিমা পৌঁছলেন মুরজিলকার বাড়ি। এতে তার লেগে গেল পাক্কা তিনটি দিন।

মুরজিলকার আক্কেল গুড়ুম! ভাবলে সে, “আমাকে ডাকল একটা জরুরী কাজে, পাঠাল কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির বিজলি টেলিগ্রাম, আর টেলিগ্রাম আমার হাতে পৌঁছল কিনা শামুকের গতিতে! দ্যাখো কাণ্ড!”

তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল মুরজিলকা।
কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে তার পেল্লাই ক্যামেরাখানা।
তারপর ছুটল বনের ধারে। বনের ধারে দাঁড়িয়ে
ছিল অনেকগুলো ট্যাক্সি। বনের ট্যাক্সি হলো
গুবরে পোকা।

একজন গুবরে পোকা এগিয়ে আসতেই
মুরজিলকা চড়ে বসল তার পিঠে। তারপর
গুবরে পোকার পাখা দুটি খুলে গেল,
ইঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা গেল, আর তারপর
ট্যাক্সি উড়ে চলল বাতাসে গা ভাসিয়ে।

“মশাই, আমাদের একটু জলদি যেতে হবে বুঝেছেন তো! একটু তাড়াতাড়ি করুন!” চেঁচাল মুরজিলকা।

কিন্তু ওড়ার সময় তাড়াহুড়ো মোটেও ভালো জিনিস নয়। এমনকি আকাশে ওড়ার সময়ও ট্রাফিক নিয়ম মানতে হয়। যদি কেউ ট্রাফিক নিয়ম না মানে তবে উড়তে উড়তে মধু নিয়ে চলাচল করা ব্যস্ত মৌমাছিদের সাথে ধাক্কা লেগে যাবার মতন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে খুব সহজেই।

তবু মুরজিলকার চেঁচানিতে ট্যাক্সিটা বেশ জোরেই উড়ছিল। শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে মুরজিলকার চোখে পড়ল একটা পরিচিত বাড়ি। ওই বাড়িটাতেই ছিল সেই পত্রিকা অফিস। তখন ট্যাক্সিটা খুব জোরে যাচ্ছিল বলে এক জায়গায় বাঁক নেবার সময় একটা উড়ন্ত ঘুড়ির সাথে গুঁতো লেগে গেল ট্যাক্সির।

.

আর মুরজিলকা টুপ করে ট্যাক্সি থেকে নিচে পড়ে গেল। এত উঁচু থেকে পড়ে কি মুরজিলকা খুব ভয়ানক ব্যথা পেলো?
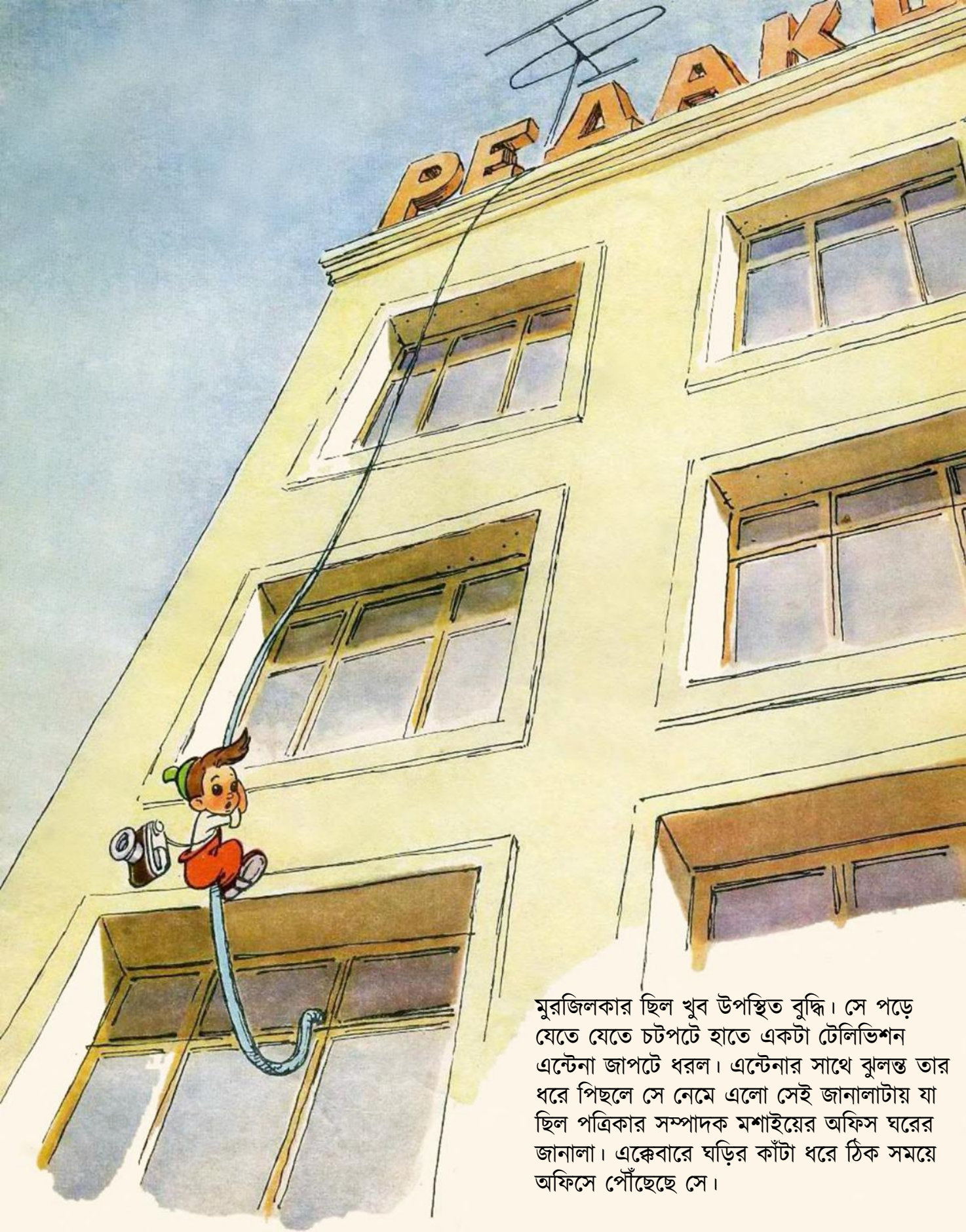
মুরজিলকার ছিল খুব উপস্থিত বুদ্ধি। সে পড়ে যেতে যেতে চটপটে হাতে একটা টেলিভিশন এন্টেনা জাপটে ধরল। এন্টেনার সাথে ঝুলন্ত তার ধরে পিছলে সে নেমে এলো সেই জানালাটায় যা ছিল পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের অফিস ঘরের জানালা। এক্কেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছেছে সে।

সম্পাদক মশাই মুরজিলকাকে দেখে বেজায় খুশি হলেন। “ওহে ছোট্ট সোনা মুরজিলকা আমার, আমাদের এবারের পত্রিকার মলাটের জন্য নতুন ছবি দরকার। একটা ভালো ছেলের ফটোগ্রাফ। যে কিনা খুব বাধ্য, বিনীত, সদয় আর অমায়িক। সবার জন্য একটা ভালো উদাহরণ হবে সে।”

“যেমন আপনি চাইছেন তেমনই হবে”, বলে ঝটপট কাজে নেমে গেল মুরজিলকা।
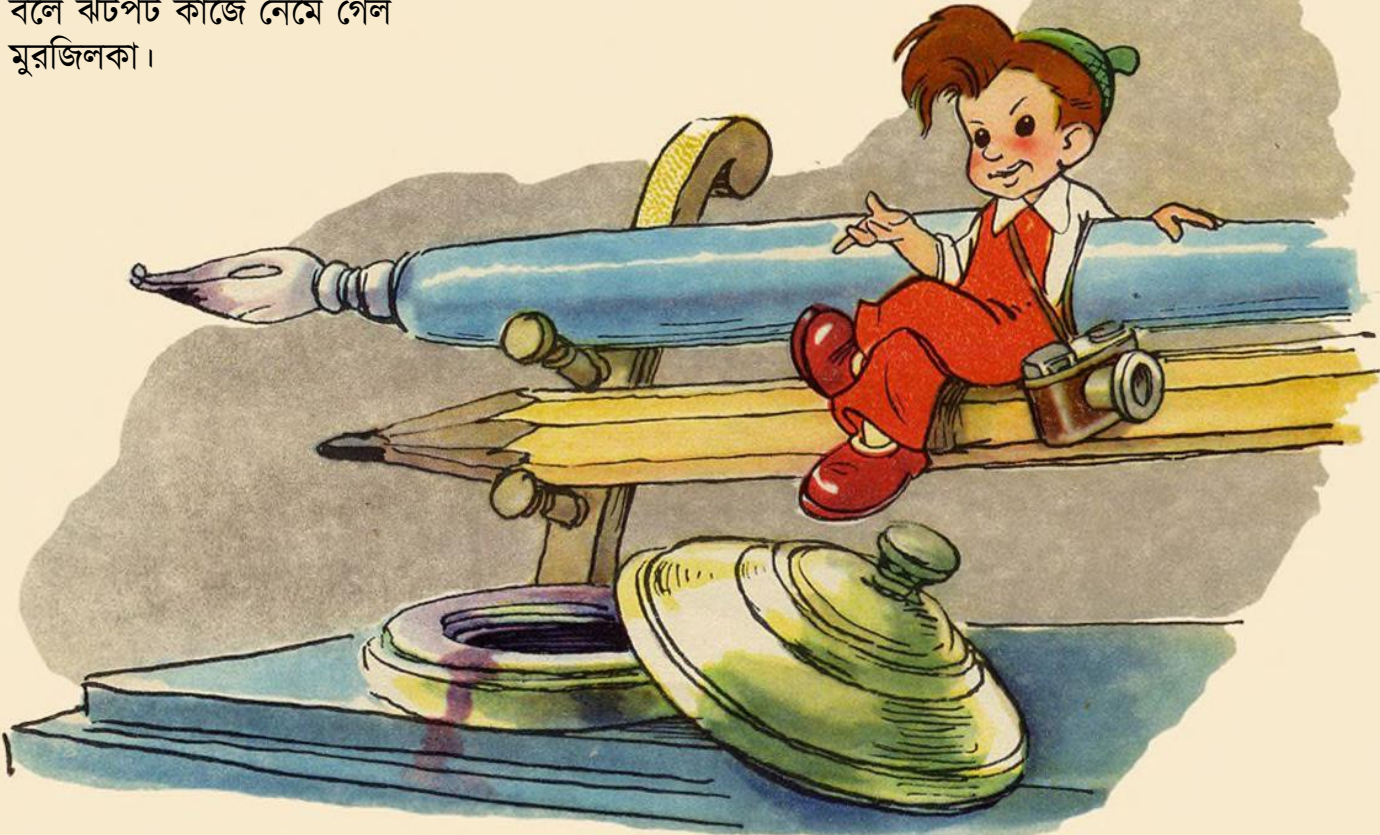
কি ভাগ্য! মুরজিলকার চোখ পড়ল
রাস্তার ওই পারের বাড়ির একটা
জানালায়। একটি সুন্দর ছেলে তার
মায়ের কাছ থেকে চুমো খেয়ে বিদায়
নিচ্ছে। যেমন ভদ্র দেখতে ছেলেটি
তেমনি সে পোশাকে পরিপাটী।

রাস্তার ওপরে ঝুলন্ত সব তারের ওপর দিয়ে সার্কাসের কসরত করে সে এ বাড়ির ছাদ থেকে ও বাড়ির ছাদের দিকে রওনা হল। তারগুলোর উপর দিয়ে খানিক হেঁটে, খানিক ঝুলে, খানিক লাফিয়ে সে নামল গিয়ে ওই ভালো ছেলেটার জানালায়।
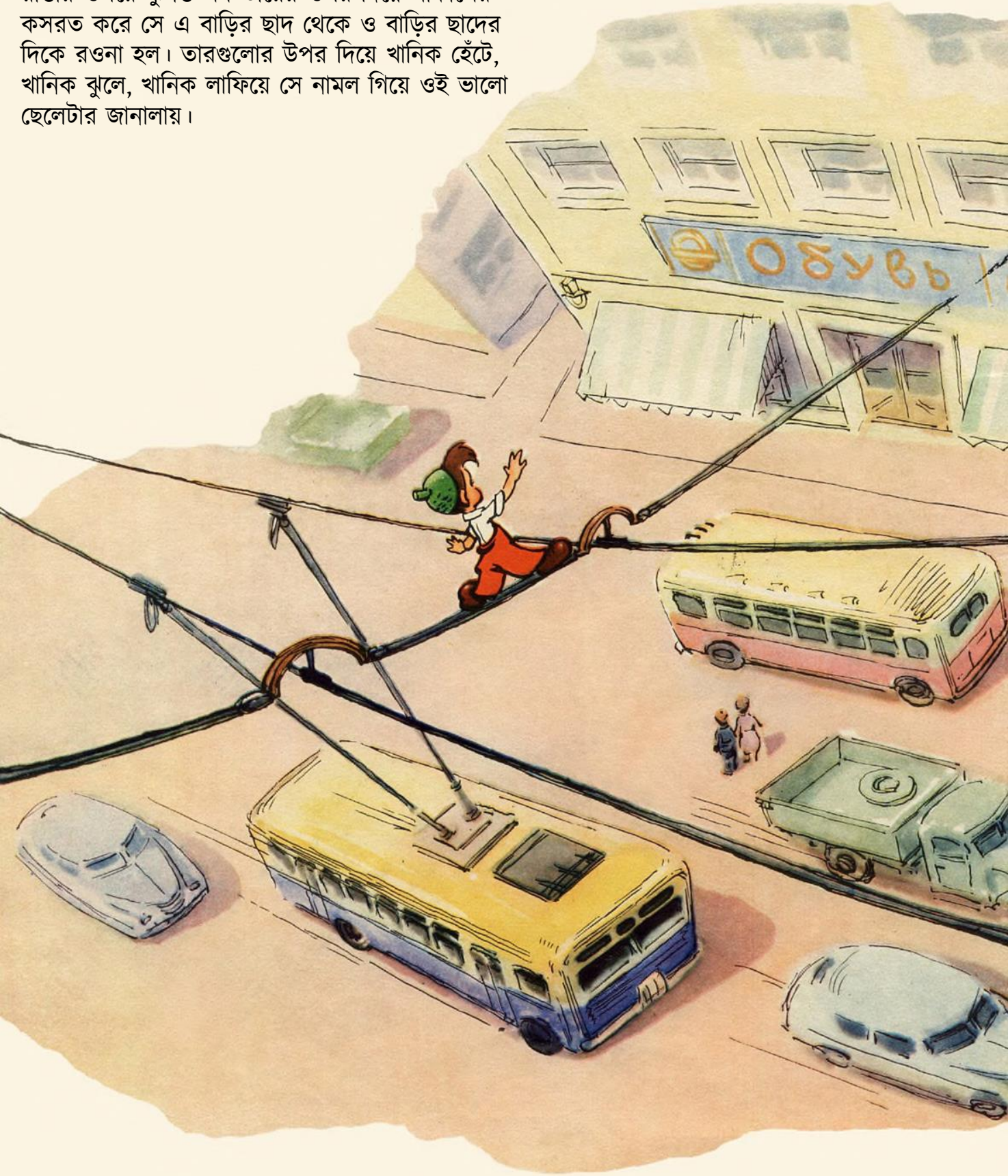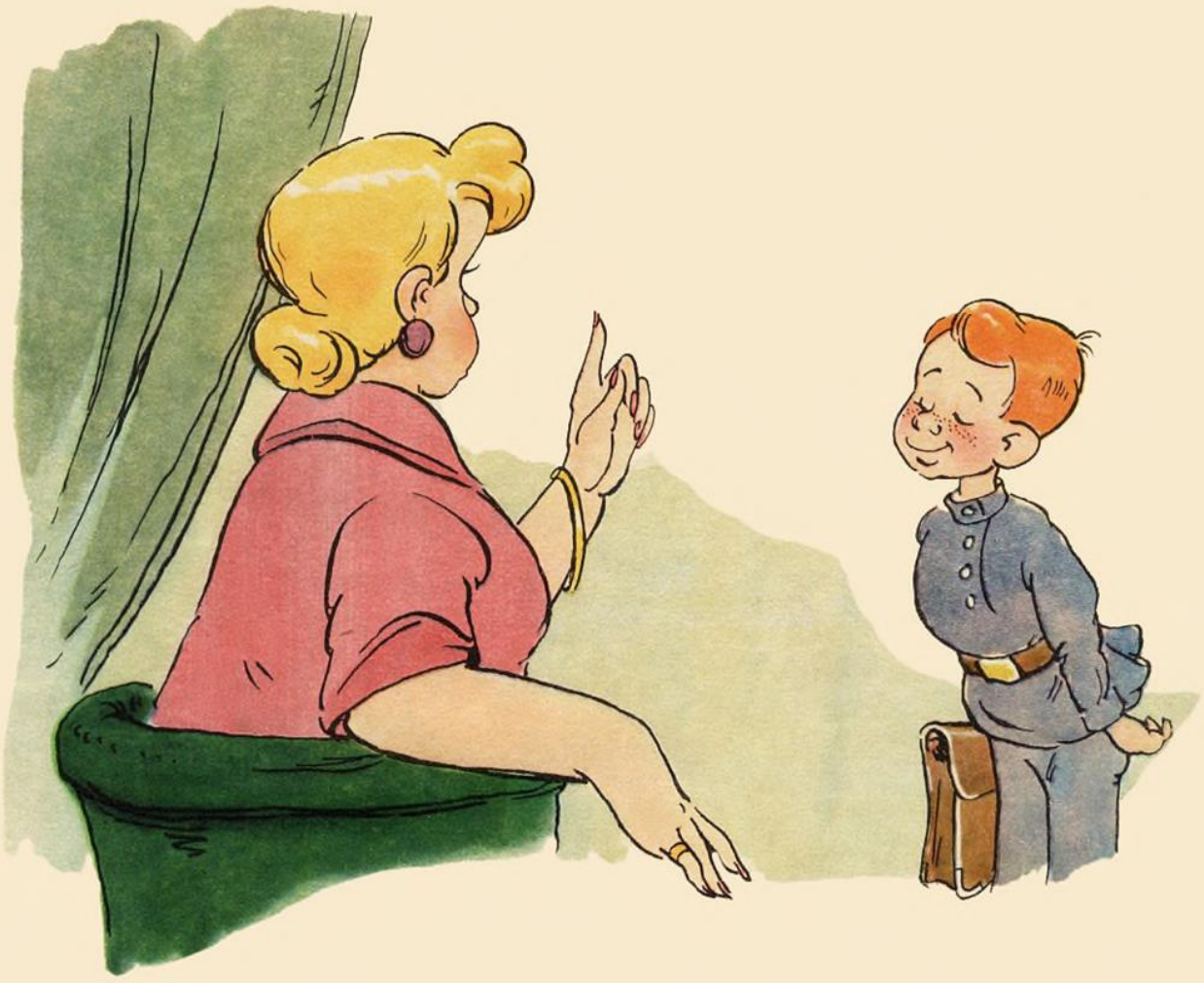
জানালার বাইরে কার্নিশে দাঁড়িয়ে সে কান পেতে শুনল মা কি বলছেন ছেলেকে।
"কাল তোকে একটা চমক দেবো পেতিয়া, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন ইশকুলে যা।"
"এইই তো চাই! ভালো ছেলের ছবি বটে!"
বলেই মুরজিলকা ঝটপট তুলে নিলো তার প্রথম ফটোগ্রাফ।

“ধন্যবাদ মা! আমি সোজা ইশকুলেই যাব। তাঁর আগে ছোট্ট বেড়ালছানাকে খাবার দিয়ে যাই। ওর অনেক খিদে পেয়েছে।”
“বাহ! এই অনুকরণীয় ভালো ছেলেটার ফটোগ্রাফ তো সারাবছর ব্যবহার যাবে মনে হচ্ছে!”
মনে মনে বলল মুরজিলকা। তারপর আরেকটা ফটোগ্রাফ তুলল সে।

মুরজিলকা ভাবল এই অতি ভালো ছেলেটার খবর অতি সত্বর তার সম্পাদক মশাইকে দেওয়া দরকার! তাই সে দৌড়ে গেল কাছাকাছি একটা টেলিফোনের কাছে।
কিন্তু ফোন করবে কেমন করে? টেলিফোনে পয়সা ফেলে তবে ফোন করতে হয়... তার সাথে তো কোনো পয়সা নেই! কি ভাগ্যি! ঠিক তখন তার সামনের ফুটপাথেই পড়ে ছিল একটা পয়সা।
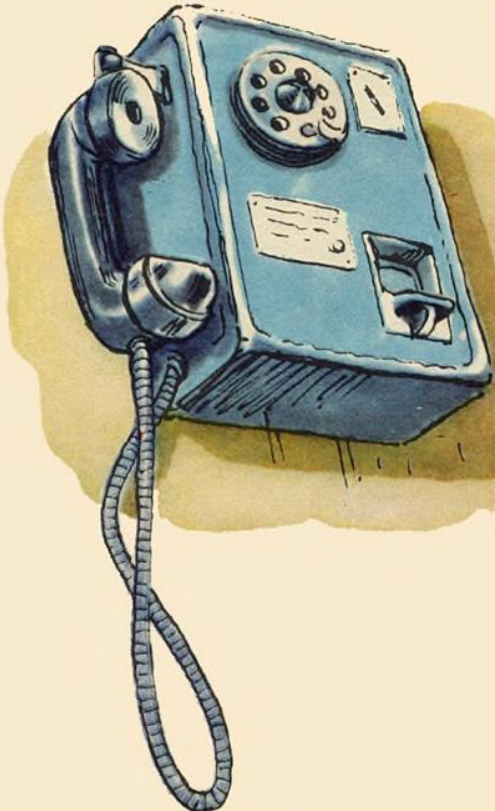
টেলিফোন করার কাজটা ছোট্ট মুরজিলকার জন্য ছিল সত্যিই এক ঝক্কির কাজ।
ক) প্রথমে টেলিফোনের স্লটে পয়সা ঢোকাতে হল মুরজিলকার।

খ) তারপর টেলিফোনের গায়ের লিভার টেনে টেনে তার দরকারি নম্বরটা ডায়াল করতে হল।
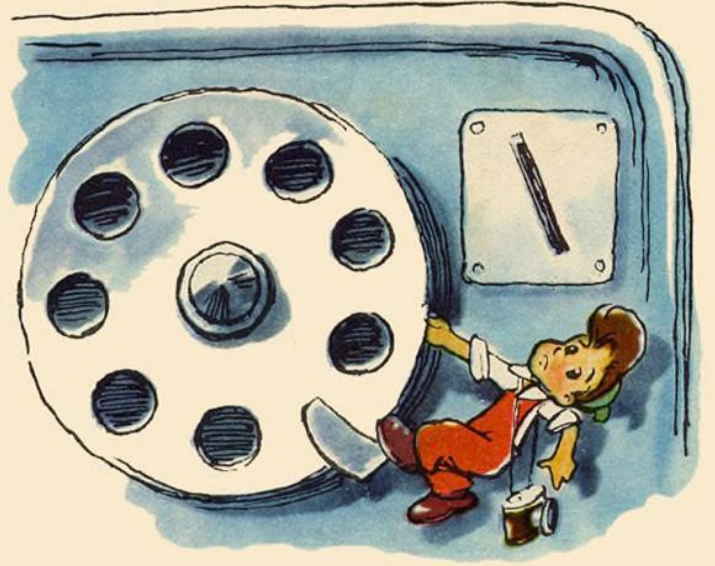
গ) অবশেষে মুরজিলকা সম্পাদক মশাইয়ের সাথে কথা বলতে পারল। তাঁকে সে জানালো যে অতি ভালো একটি ছেলের সন্ধান সে পেয়েছে যা ম্যাগাজিন মলাটে এক্কেবারে ঠিকঠাক বসবে। কথা শেষ করেই সে ছুটল সেই বাধ্য, বিনীত, সদয় আর অমায়িক ছেলের ছবি তুলতে।

কিন্তু এ কি দেখছে সে? পেতিয়া পুরোপুরি বদলে গেছে! বই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে কেন সে? কেনই বা ছোট্ট বেড়ালছানার ল্যাজ ধরে তুলে ঝাঁকাচ্ছে?

আর কেনই বা সে ইশকুলে যাচ্ছে না? সে ইশকুলের উল্টো পথ ধরে কোথায় যাচ্ছে?
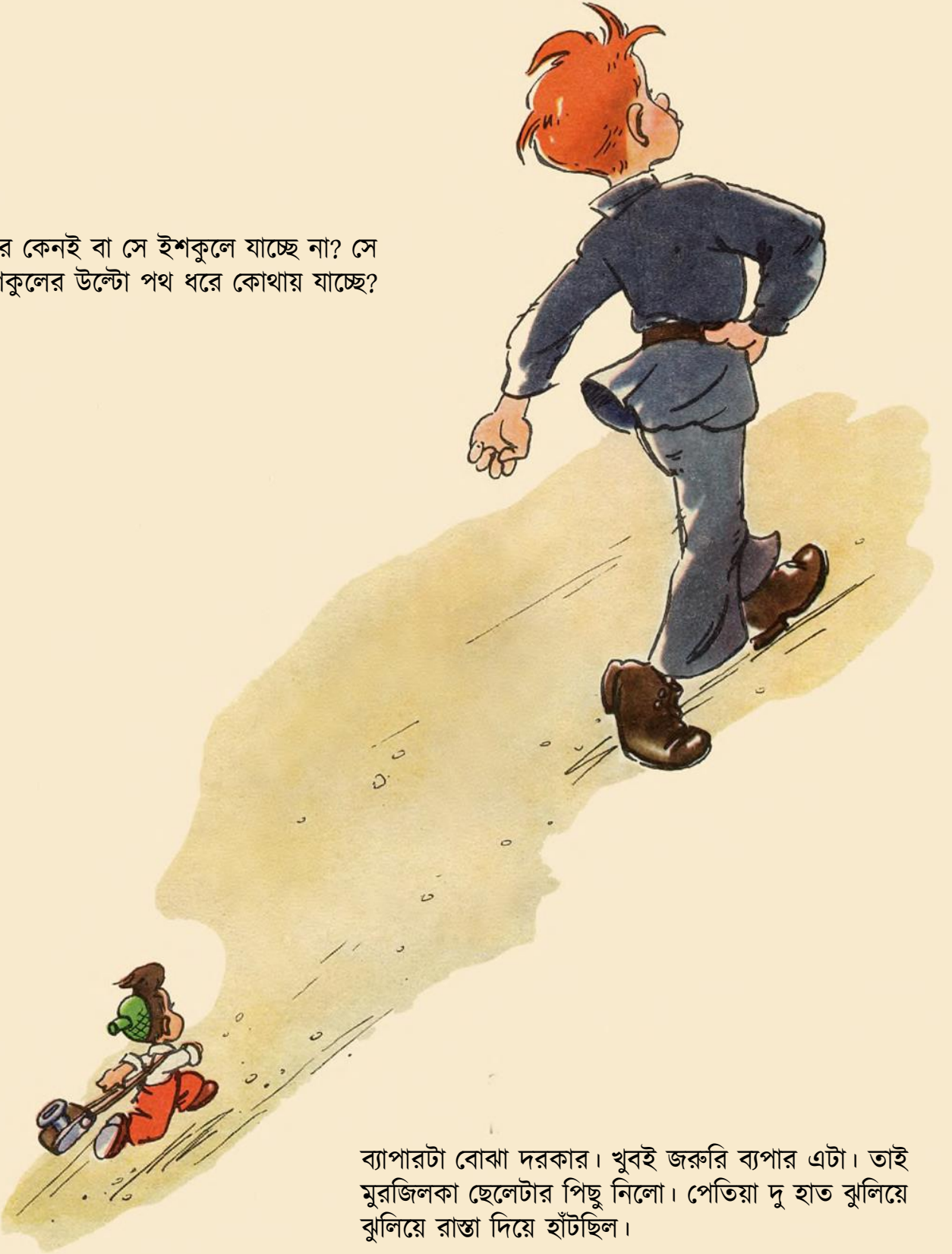
ব্যাপারটা বোঝা দরকার। খুবই জরুরি ব্যাপার এটা। তাই মুরজিলকা ছেলেটার পিছু নিলো। পেতিয়া দু হাত ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল।

ময়লা ফেলার জায়গায় গেল সে। টিনের ডাস্টবিনে দিলো এয়সা এক লাথি। ডাস্টবিন উল্টে গিয়ে ময়লা ছড়িয়ে একাকার হলো ফুটপাথ। তারপর সন্তুষ্টচিত্তে পেতিয়া লুকোয় গিয়ে বাড়ির এক কোণে, নজর রাখে ডাস্টবিনের দিকে। ময়লা নেবার কাজ করেন যিনি তিনি এসে তো একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন অবস্থা দেখে। কি জঘন্য কাজ!

মুরজিলকা বুঝতে পারল যে কত বড় ভুল হয়ে গেছে। তার পত্রিকার মোটেও এমন ছেলের ফটোগ্রাফ দরকার নেই।

কিন্তু তবু কেন মুরজিলকা পেতিয়ার ছবি তুলতেই থাকল একের পর এক?

পেতিয়া ইশকুলে না গিয়ে গেল পার্কে। সেখানে বেঞ্চিতে
বসে দুটি মেয়ে খুব গল্প করছে। তারা একজন আরেকজনের
সাথে ‘জীবনের বন্ধুত্ব’ পাতাচ্ছে। মানে একজন
আরেকজনকে বলছে যে আমরা সারাজীবন প্রিয় বন্ধু থাকব।
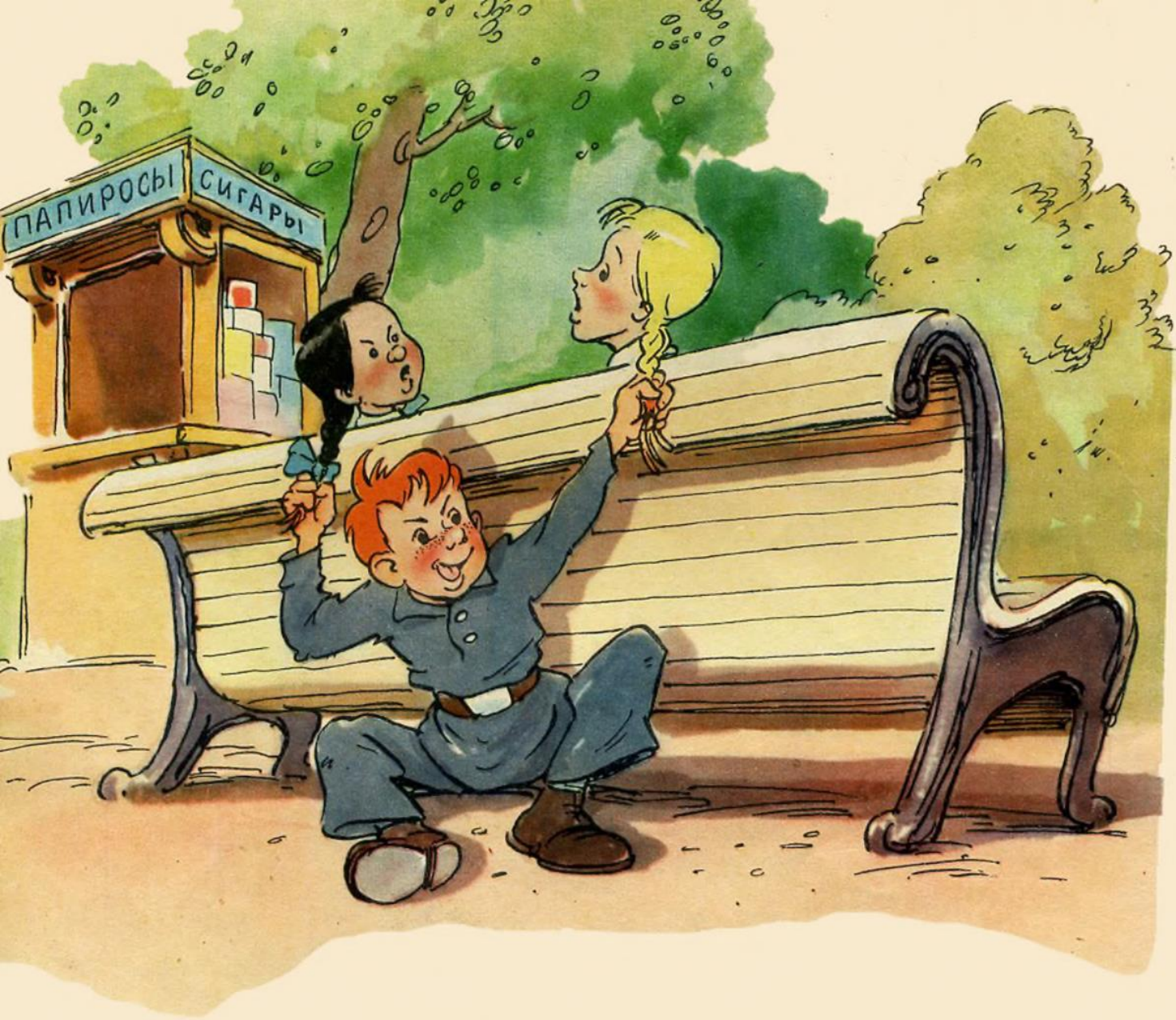
পেতিয়া চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে বেঞ্চির পেছনে গিয়ে বসল।
তারপর মেয়েদুটির বেণি ধরে হ্যাঁচকা টান মারল।
মেয়েরা দেখল না কে টেনেছে তাদের চুল। তাই একে অন্যকে
জিজ্ঞেস করল, তুই টেনেছিস বুঝি আমার চুল?
না তো! তুই টেনেছিস আমার চুল!
ও তাই! যাহ! তুই আর আমার বন্ধু না!
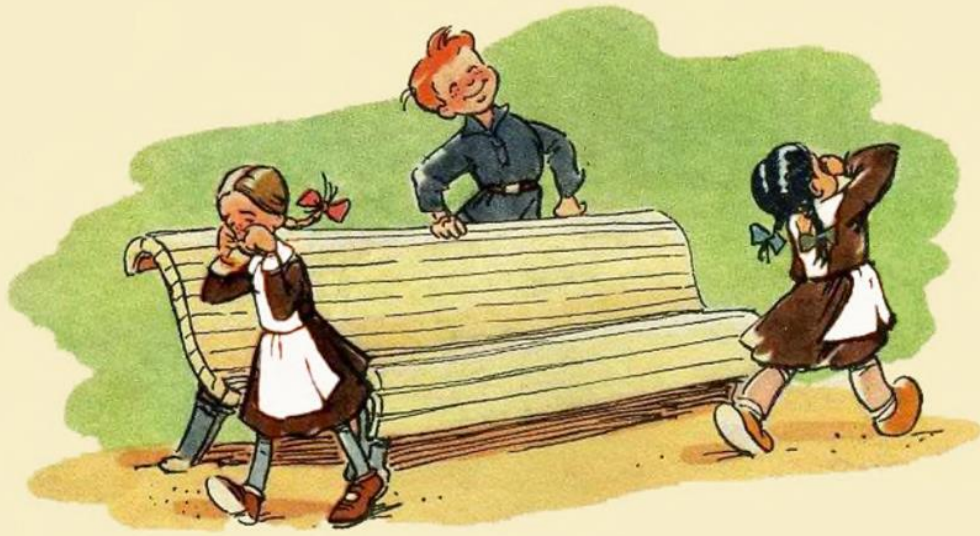
বলেই মেয়ে দুটি কাঁদতে কাঁদতে দুজন দুদিকে চলে গেল।

পেতিয়া পার্কের এদিক ওদিক তাকিয়ে নতুন কিছু রগড় করা যায় কিনা তা খুঁজছিল। মুরজিলকার পা দুটো ছোট্ট ছোট্ট তাই সে পেতিয়ার সাথে তাল রেখে দৌড়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

পেতিয়ার চোখ গেল গাছের ওপর পাখির
বাসায়। পকেট থেকে গুলতি বের করল সে।
তাক করল পাখির বাসা বরাবর।

আর সইতে পারল না মুরজিলকা। চেঁচিয়ে উঠল,
“থামো বলছি!”
কিন্তু পেতিয়া মুরজিলকার চিনচিনে গলার আওয়াজ
শুনতে পেলো না মোটেই।

তাই পেতিয়ার গা বেয়ে উঠে কাঁধে চড়ে
বসল সে, গুলতিতে পরানো পাথরটা চেপে
ধরল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করল পেতিয়া যেন
কিছুতেই পাথর না ছোঁড়ে।

নির্দয় পেতিয়া পাথর ছুঁড়ে মারল। গুলতি থেকে ছিটকে বেরিয়ে বাতাস কেটে পাথর উড়ে চলল পাখির বাসার দিকে, মুরজিলকাকে নিয়ে।

স্টার্লিং পাখির একটি পরিবার বাস করে সেই বাসায়। ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল তারা, "আমরা সবাই মরে যাব!"

"কেঁদো না তোমরা।" অভয় দিলো মুরজিলকা। "তোমরা হলে স্টার্লিং পাখি, তোমরা যে কোনো শব্দ নকল করতে পারো। তোমরা কি মিলিশিয়াম্যানের হুইসেল নকল করতে পারবে?"

"অবশ্যই পারব!"

তারপরেই শোনা গেল মিলিশিয়াম্যানের বাঁশির মতন তীব্র হুইসেলের আওয়াজ। আর পেতিয়া ভয় পেয়ে হাতের গুলতিটা ফেলে দৌড়ে পালাল।

শেষ ফটোগ্রাফটা তুলে নিলো মুরজিলকা। তারপর
স্টার্লিং পাখির পিঠে চড়ে উড়ে চলল পত্রিকা
অফিসের দিকে।

পরদিন সকালে ডাকপিয়ন মশাই
পেতিয়ার বাড়িতে দিয়ে গেল
'মুরজিলকা' পত্রিকাটি।

মা বলল, "এই নে পেতিয়া তোর সারপ্রাইজ!"
"ধন্যবাদ মা!" বিনীত গলায় বলল পেতিয়া। তারপর
সে পত্রিকাটা খুলল।

কিন্তু ভেতরে এ কী দেখছে সে! বড় বড় করে লেখা, "কেমন ছেলে পেতিয়া?"
হেডিং এর নিচে একের পর এক পেতিয়ার ফটোগ্রাফ। পেতিয়া বেড়ালছানার ল্যাজ ধরে ঝুলিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছে। পেতিয়া ডাস্টবিনে লাথি দিচ্ছে। পেতিয়া দুটি মেয়ের বেণি ধরে টানছে। পেতিয়া স্টার্লিং পাখির বাসায় গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ছে।

“ধন্যবাদ মুরজিলকা”, বললেন সম্পাদক মশাই। “এখন সবাই জানবে যে পেতিয়া কথায় এক আর কাজে আরেক। সে সবার সামনে মুখে যা বলে, সবার আড়ালে করে তার একেবারে উল্টোটা। এ মোটেও ভালো মানুষের কাজ নয়। আর আমরা তাহলে এবার একটি সত্যি সত্যি ভালো ছেলেকে খুঁজে বের করব আমাদের পত্রিকার আগামি সংখ্যার প্রচ্ছদের জন্য।”

"আবার দেখা হবে, প্রিয় বন্ধুরা!"

আনাতোলি কারানভ, নিকোলাই ইয়ের্দমান।
মুরজিলকার এডভেঞ্চার
ছবি এঁকেছেন ই. রাইকোভস্কি, আ সাভচেঙ্কো, বি স্তেপানস্তেভ

শিশু-শ্রেণির জন্য; ইশকুলে যাবার বয়স হয়নি যাদের

.

ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ইয়েভগেনি স্পিরিন
(সাসনোভোবরস্ক, ক্রাসনয়ারস্ক অঞ্চল, রাশিয়া)
সম্পাদনা করেছেন অরভিন্দ গুপ্তা (পুনে, ভারত)
বাংলা অনুবাদ করেছেন চৈতী রহমান (ঢাকা, বাংলাদেশ)
লেআউট করেছেন অরভিন্দ গুপ্তা, ইয়েভগেনি স্পিরিন

International project:
"Mini Progress and Mini Raduga"